সংবাদ

22 MAR 2003

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণ ও বদলি আতঙ্ক

অধ্যাপিকা খুরশীদ জামান

'যে জাতি শিক্ষায় বড়, সে জাতি যেমন মনে বড়, তেমনি ধনেও বড়।' এ কথা জ্ঞানী-মনীষী সবাই বলে গেছেন। একটি জাতিকে শিক্ষায় অগ্রণী করে তোলার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন শিক্ষক। তিমিরবিদারী সূর্যের মতো আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য সমাজের প্রতি তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ।

একজন আদর্শ শিক্ষক দলমত নির্বিশেষে ছাত্রসমাজের তিনি গুরু ও পথ প্রদর্শক। তার কোন দল নেই। শতদলের মতো বিকশিত করার ধ্যানই তার একমাত্র ব্রত। কিন্তু বর্তমানে দেশে এক অস্থিরতা, অশুভ শঙ্কা এ শিক্ষক সমাজকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শিক্ষক সমাজ আজ দলীয়করণের নির্মম শিকার। নির্মম সত্য এই যে, মনে হয় কর্তৃপক্ষ আজ বাতি নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কে আওয়ামী লীগ করে আর কে বিএনপি করে।

২০০১ সালের নভেম্বর মাসে বিসিএস শিক্ষা সমিতির নির্বাচনের প্রাক্কালে (বর্তমান সরকার সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছেন) হঠাৎ করেই যখন সমিতি হাইজ্যাক হয়ে গেল, তখনই বুঝেছিলাম জাতীয় জীবনে দুর্যোগের ঘনঘটার সূচনা হলো। গত দিনে অনেক সরকার এসেছে, আবার চলে গেছে। তবে শিক্ষকদের মধ্যে ঐক্যের ফাটল কখনও ধরেনি। ব্যক্তিবিশেষ সুবিধা ভোগের জন্য ছোটখাট আলাদা সমিতি গঠনের চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারেনি কখনও।

গত সরকারের শেষ সময় বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার বেড়াজালে পেরিয়ে যখন পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তখন কিন্তু কোন দলীয়করণ হয়নি। যদি তাই হতো তাহলে কট্টর বিএনপিপন্থী অনেকেই বাদ পড়তেন। বর্তমানে বেশ কিছু কলেজে সিনিয়রিটি লঙ্ঘন করে অনেকে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেছেন। এদের প্রায় সবাই ২০০১ সালে পদোন্নতি পেয়ে ঢাকাতেই পোস্টিং পেয়েছেন। সে সময় অনেকে ঢাকার বাইরেও গেছেন, সেটা শুধু শূন্য পদের অভাবে। সে সময় কিন্তু শিক্ষামন্ত্রণালয় এ চিন্তা করেননি যে, কারা লীগ করেন বা কারা বিএনপি করেন।

২০০১ সালের অক্টোবরে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি এদেশের ইতিহাসে যা হয়নি তাই হতে শুরু করেছে। এদেশে কখনও অনিয়ম বা অন্যায় হয়নি, তা বলব না। অন্যকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করা- এমন অন্যায় তো হরহামেশাই হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তবে এটা কখনও সরকারি নীতি ছিল না। ব্যক্তিবিশেষের অন্যায় ছাড়া এটা কিছু নয়- এটা বিবেকবান ব্যক্তি কখনই ভাল চোখে দেখেনি।

শোনা যায়, অনেককেই কালো তালিকাভুক্ত করে বিশেষ একটা ফাইল খোলা হয়েছে (অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকা তৈরির মতো)। এখানে কোন শিক্ষক কোন মতবাদের, তাদের চৌদ্দপুরুষ কোন দল করেছেন বা কাকে ভোট দিয়েছেন। অথবা কাদের কাদের বাড়ি গোপালগঞ্জে এটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তা না হলে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদরুন্নেসা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষের বাড়ি গোপালগঞ্জ হওয়ায় তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি করা হতো না। সূত্রমতে এসবই নাকি অদৃশ্য হাতের কারসাজি। এমনকি ওই কলেজেরই ইংরেজি বিভাগের জনপ্রিয় প্রভাষিকার নানার বাড়ি গোপালগঞ্জ হওয়ায় তাকেও একটি প্রজেক্ট এ বদলি করে দেয়া হয়। একটি স্বাধীন দেশের মন্ত্রণালয় যদি এ রকম ছেলেমানুষী করে তাহলে বলার কিছু থাকে না।

> গত সরকারের শেষ সময় বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার বেড়াজালে পেরিয়ে যখন পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তখন কিন্তু কোন দলীয়করণ হয়নি। যদি তাই হতো তাহলে কট্টর বিএনপিপন্থী অনেকেই বাদ পড়তেন। বর্তমানে বেশ কিছু কলেজে সিনিয়রিটি লঙ্ঘন করে অনেকে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেছেন। এদের প্রায় সবাই ২০০১ সালে পদোন্নতি পেয়ে ঢাকাতেই পোস্টিং পেয়েছেন। সে সময় অনেকে ঢাকার বাইরেও গেছেন, সেটা শুধু শূন্য পদের অভাবে। সে সময় কিন্তু শিক্ষামন্ত্রণালয় এ চিন্তা করেননি যে, কারা লীগ করেন বা কারা বিএনপি করেন।

ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ইডেনসহ দেশের বিভিন্ন কলেজ থেকে শিক্ষকদের বদলি করে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন কলেজে। কাউকে যেতে হয়েছে খাগড়াছড়ি, কাউকে বান্দরবান বা দিনাজপুর। অভিযোগ সেই পুরনো। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কাউকে সরাতে হলে যাচাই করা উচিত শিক্ষকের মেধা, ছাত্রদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা, অথবা তিনি ছাত্রদের নিয়ে সক্রিয় রাজনীতি করেন কিনা (সরকারি কোন কর্মচারী সক্রিয় রাজনীতি করতে পারেন না)। জগন্নাথ কলেজে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক সহযোগী অধ্যাপককে যুক্তিহীনভাবে বদলি করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে, যিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও একনিষ্ঠ শিক্ষক। তার অপরাধ হলো তার স্বামী সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মকর্তা ছিলেন। আজকে নারী প্রগতির যুগে স্ত্রীকে বিচার করা হয় স্বামীর মানদণ্ডে, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে। অথচ বদরুন্নেসা কলেজে আমি তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রাক্তন পিএস-এর স্ত্রী এবং একজন বিএনপি পন্থী রাজনীতিবিদের স্ত্রীকে সসম্মানে চাকরি করতে দেখেছি। বাংলা বিভাগে চেয়ারম্যানের পদে বিএনপির প্রাক্তন সিনিয়র সহ-সভাপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পিএস দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এ অপরাধে আওয়ামী লীগ সরকার তো তাকে অন্যত্র বদলি করেনি বা বরখাস্ত করেনি। বর্তমানে ঢাকার বিভিন্ন কলেজে যারা বর্তমানে অধ্যক্ষ, তারা অনেকেই মন্ত্রী বা সচিবের স্ত্রী। তারা কিন্তু সেই আমলেও পদোন্নতি পেয়ে ঢাকাতেই ছিলেন। দলীয় রোষে কাউকে ঢাকার বাইরে পাঠানো হয়নি।

মজার ব্যাপার এ যে, বর্তমান সরকারের আমলে জগন্নাথ কলেজের সমাজবিজ্ঞানের দিবা বিভাগের এক শিক্ষককে বদলি করে দেয়া হয় এই বলে সে তিনি নাকি জগন্নাথ কলেজ থেকে আগে বদলিকৃত সহযোগী অধ্যাপকের বান্ধবী। ছেলেমানুষী আর কাকে বলে! যিনি আগে হোস্টেল সুপার ছিলেন তাকেও বদলি করা হয়েছে। ইডেন কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সময় নাকি আওয়ামী লীগ আমলের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী নাকি তার হোস্টেলে গিয়েছিলেন এবং তিনি নাকি তাকে চা খেতে বলেছিলেন। এ ভদ্রতা তো স্বাভাবিক! হায়, আমরা কোন্ সমাজে বাস করছি।

মাত্র দু'মাস আগে ঢাকা কলেজের এক অধ্যক্ষকে (তার অবসরের মাত্র ৮/৯ দিন বাকি ছিল) হঠাৎ করে উপাধ্যক্ষ করে বরুন্নেসা কলেজে পাঠিয়ে দেয়া হলো- যাকে অধ্যক্ষ করা হলো তিনি বর্তমান সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর স্ত্রী। ভদ্রলোককে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের আগে এ অসম্মানটুকু না করলেই কি হতো না- এ ব্যবস্থাতো কয়েকদিন পরেই করা যেত। এছাড়া বিভিন্ন কলেজে সিনিয়র শিক্ষকের মাথার ওপর বসিয়ে দেয়া হচ্ছে জুনিয়র শিক্ষককে অধ্যক্ষ করে।

যারা অর্ডার দেন এবং যারা অর্ডার পালন করেন, তাদের কাছে শিক্ষক সুলভ আচরণ কি আমরা আশা করতে পারি না! জগন্নাথ কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান সময়ের আগেই চাকরি ছেড়ে দিলেন তাকে ডিঙিয়ে তার জুনিয়রকে অধ্যক্ষ করার জন্য। বদরুন্নেসা কলেজের উপাধ্যক্ষও চাকরি ছেড়ে দিলেন সময়ের আগেই- হয়ত এসব আলামত দেখেই মানসম্মান হারানোর ভয়েই। এরা কেউই কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিও করেন না এবং আওয়ামী লীগ তো করেনই না। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষাপীঠের অধ্যক্ষ, শিক্ষককে বাধ্যতামূলক অবসরে বা পদচ্যুত করা হয়েছে যারা দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠান চালিয়েছেন। ভিকারুন্নেসা স্কুল, তেজগাঁ কলেজ, উদয়ন স্কুলের কথা তো মোটামুটি সবাই জানেন।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রীকে একজন উচ্চশিক্ষিত এবং উদার মনমানসিকতার অধিকারী বলেই জানি, যিনি জীবনের অনেকটা সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। আশা করব শিক্ষাঙ্গনে এ দলীয়করণ নিশ্চয়ই তিনি বন্ধ করবেন, অন্ততপক্ষে বদলি আতঙ্ক এবং পদমর্যাদার অসম্মান থেকে তো বটেই। শোনা যায় সম্প্রতি বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে পাতারহাট কলেজের (ইন্টারমিডিয়েট কলেজ) একজন অধ্যক্ষকে, যিনি সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার। অন্তত শিক্ষা বিভাগের উন্নতিকল্পে মেধা এবং সিনিয়রিটির মূল্য দেয়া যেকোন মূল্যে আবশ্যক। হয়ত অনেক তথ্যই শিক্ষামন্ত্রীকে গোপন করে হয়, যা তিনি জানতেও পারেন না। সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী অনেকেই এ অন্যায় করে যাচ্ছেন-সরকারকে অপ্রিয় করার জন্য।

আশা করি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এদিকে পুনর্বার দেবেন। কারণ শিক্ষাঙ্গন এমন এক পবিত্র জায়গা, সেখানে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা মানুষ হতে আসে।

শিক্ষকের কোন দল নেই (যিনি এসব করেন, তিনি শিক্ষক নামের কলঙ্ক)। শিক্ষকের আদর্শ, তার মুখের বাণী যেন দলমত নির্বিশেষে সুরের মায়াঞ্জন ছড়িয়ে দেয়। হিংস্রতার বিষবাষ্পে এ সমাজ, এই শিক্ষাঙ্গন যেন কলুষিত না হয়- এটাই আমাদের ব্রত হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একথা বলেই শেষ করব :

হিংসার উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।